আলো আঁধারের যাত্রী

অভিজিৎ রায়

পর্ব্ব ৪

মহাবিস্ফোরণ এবং প্রসারমান মহাবিশ্ব

অ্যারিস্টটলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে একটি সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের বিশ্বজগৎকে দেখবার চিন্তা-ভাবনার উত্তরণ ঘটাতে আক্ষরিক অর্থেই মানুষের হাজার বছর সময় লেগেছে। তারপর থেকে মহাকাশ নিয়ে অন্তহীন কৌতূহল তো মানুষের কমেনি - বরং বেড়েই চলছে ক্রমাগত। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এই পুরো দশকটি পদার্থবিদ আর জ্যোতির্পদার্থবিদদের জন্য স্বর্ণদশক বলা যেতে পারে। তাদের হাত দিয়েই মূলত এ সময় পদার্থবিদ্যার এক নতুন শৃঙ্খলার জন্ম হয়, যার নাম কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (Quantum Mechanics)। আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই জ্যোতির্পদার্থবিদদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল 'প্রকৃতি আর মহাকাশকে' নতুনভাবে দেখার। সেই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানীদের মনে দানা বাঁধছিল, 'কত বড় আমাদের এই বিশ্বজগৎ'? - এই প্রশ্ন। কোথায় এর সীমা, নাকি অন্তহীন? এর বয়সই বা কত? কীভাবে তৈরি হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক উপাদানসমূহ? মহাবিশ্বে জড়-পদার্থসমূহ কীভাবে ছড়িয়ে আছে? মহাবিশ্ব কি চিরকাল এমনিভাবে বিদ্যমান-শাশ্বত, না এর কোনও শুরু ছিল, ছিল সৃষ্টিলগ্ন? বিশ্বজগতের পরিণতিই বা শেষপর্যন্ত কি হবে - চিরকাল ধরে টিকে থাকবে, নাকি এর মহাসমাপ্তি ঘটবে? এমনতরো আকর্ষণীয় হাজারও প্রশ্ন বিজ্ঞানী মনকে তোলপার করে আসছে যুগ যুগ ধরে!

বস্তুত এই প্রশ্নগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে তার কেন্দ্রে রয়েছে প্রসারমান মহাবিশ্বের (Expanding Universe) ধারণা। ব্যাপারটি ভাল মতো আত্মস্থ করলেই উপযুক্ত প্রশ্নগুলোকে বুঝবার মতো পরিস্থিতিতে যাওয়া সম্ভব।

মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে কথা শুরুর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার স্বর্ণযুগ বলে যে সময়টিকে অভিহিত করেছি সে সময় শুধু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরাই নয়, প্রাচ্যের বিজ্ঞানীরাও তাৎপর্যময় অবদান রেখেছেন। অন্তত পাঁচটি অবদানের কথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করা যায়ঃ (১). সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব, (১৯২০), (২) বোস সংখ্যায়ন (১৯২৪), (৩) রমন বিক্ষেপণ (১৯২৮) ও (৪) চন্দ্রশেখরের সীমা (১৯৩৪-৩৫) এবং (৫) জাপানি পদার্থবিদ ইউকাওয়ার সবল নিয়ক্লিয় বলের মেজন বিনিময় তত্ত্ব (১৯৩৫)। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন (মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোস) ছিলেন বাঙালি। মেঘনাদ সাহা পূর্ববাংলার (যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ) সন্তান, জন্মেছিলেন ঢাকার অদূরে বলিয়াদি'র শ্যাওরাতলি গ্রামে, ছেলেবেলায় প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি ওই গ্রামের স্কুলেই। মাধ্যমিক ও

সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৪)

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়েছেন ঢাকা শহরে এসে- যথাক্রমে ঢাকা কলেজিয়েট ও জুবিলী স্কুল এবং ঢাকা কলেজে। ছাত্রজীবনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও ছিলেন সমান সক্রিয়; ছিলেন মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদের আমরণ পৃষ্ঠপোষক। আর সত্যেন বোস, কোয়ান্টাম সংখ্যায়নে তার যে বিখ্যাত অবদান, যা এখন 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' নামে খ্যাত, তা কিন্তু উদ্ভাবন করেছিলেন পূর্ব বাংলার মাটিতে বসেই ১৯২৪ সালে যখন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার তরুণ অধ্যাপক। আজ আমরা যে 'বোসন কণিকার' নাম শুনি তা পরবর্তীকালে এই সত্যেন বোসের নামানুসারেই রাখা হয়েছিল। মূলত সাহা, বোস ও রমনের আবিষ্কার তিনটির সূত্রপাত ঘটেছিল আমাদের উপমহাদেশে, আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে হলে বলতে হবে বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশে। আর চতুর্থ আবিষ্কারটি চন্দ্রশেখরের, ঘটেছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে। চন্দ্রশেখরের আবিষ্কারটি সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, কারণ পুস্তকের পরবর্তী অংশের সাথে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ইউকাওয়া তত্ত্ব পরবর্তী পর্বে আলোচনায় আসবে।

চন্দ্রশেখরের পুরো নাম সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৪), জন্মসূত্রে দক্ষিণ ভারতীয় মাদ্রাজী। তিনি যখন ইংল্যান্ডে কেম্ব্রিজে পিএইচডি (Ph.D) করছিলেন সে সময় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের উৎপত্তি আর বিনাশ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। একটি নক্ষত্র যখন এর জীবনকালের (lifetime) প্রান্তঃসীমায় এসে পৌঁছায়, তখন এর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে অবিশাস্য গতিতে। এই তাপমাত্রার প্রভাবে অব্যবহৃত হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ পরিণত হতে থাকে হিলিয়াম পরমাণুতে।

এভাবে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রী কেলভিন-এ (108 0K) পৌঁছায়, তখন নতুন এক ধরনের ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হয়- এর ফলে হিলিয়াম পরমাণুসমূহ নিউক্লিয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বণ পরমাণুতে পরিণত হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি 'ট্রিপল - আলফা' বিক্রিয়া নামে অভিহিত। এভাবে একটি নক্ষত্র ক্রমশ এর আয়তন বৃদ্ধি করতে করতে অবশেষে পরিণত হয় লোহিত দানবে (red giant)। আমাদের সূর্যও প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে এমনি একটি লোহিত দানবে পরিণত হবে। যখন এরকম একটি তারার সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ হয়, তখন এর নিজস্ব ভরের কারণে সৃষ্ট প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টানে সঙ্কুচিত হতে থাকে। অবশেষে এর আয়তন ছোট হতে হতে আমাদের পৃথিবীর সমান আয়তনের একটি তারায় পরিণত হয়, কিন্তু এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রতি ঘনমিটারে একশ কোটি কিলোগ্রাম, অর্থাৎ 109 kg/m3 বা 106 gm/cc, যেখানে আমাদের পরিচিত পদার্থগুলার মধ্যে প্লাটিনামের ঘনত্ব হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ২১.৪ গ্রাম, পারদের ঘনত্ব হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১৩.৬ গ্রাম, আর হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘনত্ব হল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র ০.০৯ গ্রাম। এ ধরনের অতি ঘনত্ব বিশিষ্ট রূপান্তরিত নক্ষত্রকে বলা হয় শ্বেত বামন (white dwarf)। সাধারণ একটি নক্ষত্রের সাথে শ্বেত বামনের পার্থক্য হল -